জলসত্র

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি-মশায় শিষ্য-বাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠমাসেরখররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনদিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠলো, আর গায়ে রাখাযায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলা এ-মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করেপ্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ-কথা নববাগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেকে বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধহয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যে-দিকে চোখ যায়, সে-দিকেই কেবল চক্‌চকে খরবালির সমুদ্র! ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এতবেশী হোল যে, সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পানকরেন! কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যেযে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকেভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তার কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাসেযেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো। জিব জোর ক'রে চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধুলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে...চকচকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে...মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।... অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে লাগলেন।মনে হোতে লাগল—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি...জীবনে তিনিযত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা...পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে তো একেবারে বরফ...কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে' নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয়?..তার তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকেরকল্‌জে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে' প্রাণ হারিয়েছে। ...সত্যিই তো!...এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম...যদি তিনিও?...

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ-হাঁটার শেষে কোথায় যেন একঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ-হাঁটার বাজী জিতলে সেইজলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মত চলছিলেন। আধ-ক্রোশটাক পথ চলে' উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধহয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোন পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র! চার-পাঁচটা নূতন জালায় জল, এক পাশে একরাশি কচি ডাব! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে।আর লোকে বাঁশের খোলের এ-মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি-মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে।একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর মশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে?

একজন বলল—আহা, সে কথা রাখো, বাবা-ঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণি মশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।...একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙ্গে নিয়ে এল নলকরবার জন্যে। ...আঃ, কি ঝিরঝিরে হাওয়া। এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাওযেন অনেকটা কমে গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হোল। একজন বললে—ঠাকুর-মশায়, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেননা—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কাদের?

—আজ্ঞে ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস নাম শুনেছেন?

শিরোমণি মশায় বললেন—বিশ্বেস? সদ্‌গোপ?

—আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ! নতুন মাটির জালা ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণি-মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেল। কলুরদেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে' জল খাবেন? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী; আজ কি তিনি—ওঃ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। —নইলে, এখনি তো...

শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া?

—তা আজ প্রায় পনেরো-ষোল বছর হবে।শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এইজলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কি বলি শুনুন।বলে লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স, তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে কলা বেগুন কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করতো; এতেই তাদের সংসার চলতো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাবগঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায়না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদেরছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি ছোট বোনটি মাঠেরমাঝামাঝি এসে বললে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে—একটু এগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্ত পাড়ায় জলখাওয়াবো।

সেই 'একটু এগিয়ে' মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদেঅবসন্ন হয়ে পড়লো। বারবার বলতে লাগলো—ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায়একটু জল...

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোটমেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখেছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে একঘটি জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোট বোনটা গাছতলায় মরে' পড়ে আছে, তার মুখে একটাকচুর ডগা! এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টার যন্ত্রণায়মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে' তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নামহোল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা ক'রে বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্য তুই একটা জলসত্র করেদে।...তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিতিষ্ঠে করে' জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুষির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলবো কি বাবা ঠাকুর, এমনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরেপড়ে' ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক নাকি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যেদাঁড়িয়ে বলছে—ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমারসঙ্গে এস।...

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে—সত্যি-মিথ্যে জানি নে ঠাকুর-মশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে...

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে' এল। কতলোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠথেকে লাঙ্গল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ী অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে' ফিরছিল।গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটুজল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ডাব খাবা?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরবো তো, খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাট্‌কা কোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা পায়ে এক-পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ করে' বসে'পড়লো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তারমকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে' গেল এবং যে উকীলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলেছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হোত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যেআধসের আন্দাজ ভিজে-ছোলা উদরসাৎ করে' একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে' গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ডাঁশা খেজুরেরগন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদ রং-এর সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে ছিল।একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা-ক'—বৌ কথা-ক'।

শিরোমণি-মশায়ের বসে' বসে' মনে হোল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলী মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুরডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায়বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেছে।...এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশহাত বাড়িয়েপ্রতি নিদাঘ-মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে!...চারি ধারে যখন সন্ধ্যানামে...তপ্ত মাঠ যখন ছায়া-শীতল হয়ে আসে...তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সেমেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র-আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতেফিরে চলে' যায়।...তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি।...

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি-মশায় তাকেবললেন—ওহে বাপু,

তোমার ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে এক ঘটি জল আমায় দাও, আরইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ

আছে বললে না?